আলো পথ

এমএলই নিউজলেটার

১০ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক মানবাধিকার পরিষদের বিশেষজ্ঞ সভা

জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সভার অষ্টম অধিবেশন ২০১৫-এর ২০-২৪ জুলাই সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) নামে পরিচিত। সভায় আদিবাসী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের আহবানে এবং Office of the High Commissioner for Human Rights-এর ব্যবস্থাপনায় EMRIP সভা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণের জন্যে জাতিসংঘের Website-এ সারা পৃথিবীর আদিবাসীদের প্রতি আহবান জানানো হয়। বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও এবছর পৃথিবীর ২৫টি দেশের আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত ৩২ জন আদিবাসী নারী-পুরুষ বিশেষজ্ঞ বক্তব্য প্রদান করেন। মানবাধিকার পরিষদ-এর আমন্ত্রণে ও UN Voluntary Fund-এর আর্থিক সহায়তায় আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত কাপেং ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা ও আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত কালচারাল এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সিডিএস)- এর সাধারণ সম্পাদক বাঁধন আরেং সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভার আলোচ্যসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল Cultural Heritage। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত The World Conference on Indigenous Peoples-এও পল্লব চাকমা অংশগ্রহণ করেন।

জেনেভায় অনুষ্ঠিত সভায় বাঁধন আরেং মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MLE) নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি জানান MLE ফোরামের এডভোকেসির ফলে বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী শিশুদের জন্য ৫টি মাতৃভাষায় (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো এবং সাদরী) পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হচ্ছে।

২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন ভাবনায় আদিবাসীদের সম্পৃক্ততা, চাহিদা ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

EMRIP মিটিং শেষে United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) জেনেভা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে Chateau de Bossey গ্রামের Bogis-Bossey প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৯ জন আদিবাসী প্রতিনিধির অংশগ্রহণে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সৃষ্ট সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিরসনে সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক ২৭-৩১ জুলাই ৫ দিনের প্রশিক্ষণে পল্লব চাকমা ও বাঁধন আরেং অংশগ্রহণ করেন।

বাঁধন আরেং

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মুজিবুর রহমান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আলমগীর, মহা-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জনাব মোঃ সরকার আব্দুল মান্নান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, জনাব সৌরভ শিকদার, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব নুজহাত ইয়াসমিন, উপসচিব (বিদ্যালয়-১ অধিশাখা)। সভায় আদিবাসী শিশুদের জন্য ৫টি ভাষায় প্রণীত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) সরকার আবদুল মান্নান সভায় জানান, ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নিমিত্তে ৩টি কর্মশালা সমাপ্ত হয়েছে এবং খসড়া উপকরণ উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও রাঙামাটিতে আরো দুটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উপকরণসমূহ চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, কর্মশালা দুটির মধ্যে একটি পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং অন্যটি ময়মনসিংহ বা মধুপুর অঞ্চলে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মশালা আয়োজনের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হলে ৭ দিনের মধ্যে কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১. জানুয়ারি ২০১৬ থেকে আদিবাসী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই সরবরাহ;
২. শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
৩. শিক্ষা উপকরণসমূহ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সমতল এবং পার্বত্য এলাকায় ২টি কর্মশালার আয়োজন;
৪. চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি ও গারো ভাষার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংখ্যা জানার জন্য DPE কর্তৃক জরিপ পরিচালনা।

এনামুল হক খান তাপস

পিছিয়ে পড়েছে এমএলই উপকরণ প্রকাশের উদ্যোগ

এমএলই ফোরাম-এর ৩৫তম সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কনফারেন্স রুমে- 'এমএলই ফোরাম'-এর ৩৫তম সভা গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ বিকাল ৪.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরুন্নাহার স্বপ্না, সেভ দ্য চিলড্রেন। এছাড়া গণসাক্ষরতা অভিযানসহ বিভিন্ন সংস্থার ১৩ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় এমএলই কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে এ.এইচ.এম.মহিউদ্দিন বলেন, প্রি-প্রাইমারি ও প্রাইমারি পর্যায়ের উপকরণ উন্নয়নের অগ্রগতি হলেও এমএলই উপকরণের বিষয়টি আলাদা হওয়ায় এ বিষয়ে অগ্রগতি একটু পিছিয়ে পড়েছে। এমএলই উপকরণ উন্নয়নের জন্য ৩টি কর্মশালা হয়েছে এবং আরও একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। তারপর এমএলই উপকরণ ছাপা হবে। একটু দেরীতে হলেও ২০১৬ সালের মধ্যেই এমএলই উপকরণ বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি; অন্যথায় ২০১৬ সালে এমএলই উপকরণ বিতরণ নাও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জনাব মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, নভেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে এমএলই উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা সম্পন্ন হবে। এরপরে কর্তৃপক্ষ উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং জরিপসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জনাব ওয়াসি উর রহমান তন্ময় বলেন, Education Act-এর মধ্যে এমএলই বিষয়ের সঙ্গে কোন কোন বিষয় জড়িত তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সবার সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করলে তা Education Act-এ এমএলই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমএলই বিষয়ে আগামী ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় পর্যায়ে বড় পরিসরে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তনুজা শর্মা

উরাঁও পার্বণ

উরাঁও ভাষা

উরাঁও সমাজকের পার্বণিক পারাব মূলতঃ চারটা : সারহুল, কারাম, সোহরায় ও ফাগুয়া।

সারহুল

সারহুল সম্পন্ন হওয়েলা সাধারণ চৈত্র মাসকের চাঁন্দ ওঠেক পর কোনো একদিননে। ইটা পারিবারকের পারাব নাহি সামাজকের পারাব। সাতদিন আগে গাওয়ালকের ভিতরে অনুষ্ঠান কারেক সঠিক দিনকের কাথা কাই দেওয়া হওয়েলা।

কারাম

কারাম পারাব সম্পন্ন হওয়েলা ভাদ্র-একাদশী, পুর্ণিমা ও দশমীনে। কারাম পারাবকের মানে গাছকের পূজা লাগুন পারাব। এই পারাবকে কেন্দ্র কারকে সামাজকের ছুয়াপুতা ছোঁড়া/ছুঁড়ি হইকে ওঠায়না নাচনে বিভর, গীতনে মুখর, পিয়াসমে মত্ত। বিশেষক্যারকে ছোঁড়া/ছুঁড়ি মানকের জিউনে তাখান সৃষ্টি হয়েলা অনেক হাউস লেওয়েক আচ্ছা পরিবেশ।

এ পারাব আসলে উরাঁও ছোঁড়া/ছুঁড়ি মানকের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশকের পারাব।

সোহরাই

সোহরাই মানে গোহেল পূজা। এ পূজানে গারুকের মঙ্গল কামনা কারেক লাগুন। সোহরায় পারাব চালেলা তিন দিন ধারকে। কার্তিক মাসে আমাবস্যাকের আগের দিন সে শুরু হওয়েলা।

ফাগুয়া

ফাগুয়া শব্দকের জানাম হলাহায় তুর্কি কাথা ফাগসে, ফাগ কাথাকের মানে আবীর। উরাঁও সমাজনে এই পারাব কারায় না ফাল্গুনী পূর্ণিমানে। সে হিয়া ব্যবহার হওয়েলা প্রচুর ফাগ বা আবীর।

বৈদ্যনাথ টপ্প

বাংলা ভাষান্তর

উরাঁও সমাজের পার্বণিক উৎসব মূলত চারটি। যেমন-ফাগুয়া, সারহুল, কারাম ও সোহরায়।

সারহুল

সারহুল উদ্‌যাপন করা হয় চৈত্র মাসের চন্দ্রোদয়ের পর কোনো একদিনে। এটি পারিবারিক উৎসব নয়, সামাজিক উৎসব। সপ্তাহখানেক পূর্বেই গ্রামবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের নির্বাচিত দিনটির কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

কারাম

কারাম উৎসবটি পালন করা হয় ভাদ্র-একাদশী, পূর্ণিমা ও দশমীতে। কারাম পর্বের অর্থ 'বৃক্ষের পূজা উপলক্ষে উৎসব'। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উরাঁও সমাজের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী হয়ে ওঠে নৃত্যচঞ্চল, সংগীতমুখর, পানাহারে মত্ত। বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের হৃদয়ে তখন সৃষ্টি হয় অনাবিল আনন্দ উপভোগের পরিবেশ। এ পর্ব প্রকৃতপক্ষে উরাঁও যুবক-যুবতীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা প্রকাশের পর্ব।

সোহরাই

সোহরাই অর্থ গোয়াল পূজা। এ পূজায় গবাদিপশুর কল্যাণ কামনা করা হয়। সোহরাই উৎসব তিন দিন ধরে চলে। কার্তিক মাসে অমাবস্যার আগের দিন থেকেই শুরু হয় এ উৎসব।

ফাগুয়া

ফাগুয়া শব্দটি এসেছে তুর্কি শব্দ ফাগ থেকে। ফাগের অর্থ আবীর। উরাঁও সমাজের এই উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। তাতে ব্যবহৃত হয় প্রচুর ফাগ বা আবীর।

অনুবাদ : নীরেন উরাঁও

ম্রো সম্প্রদায়ের বর্ণমালা আবিষ্কার

ম্রোদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন মেনলে ম্রো। মেনলে একজন প্রেরিত পুরুষ। ম্রোদের বেশিরভাগ মানুষ মেনলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আশির দশকের শুরুর দিকে একদিন মেনলে ম্রো নামের এক ম্রো যুবক বান্দরবানের পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমি ক্রামাদি' (প্রেরিত পুরুষ)। থুরাইয়ের কাছ থেকে ম্রোদের জন্য বর্ণমালা ও ধর্ম নিয়ে এসেছি।

র্যাং রাং ম্রো জানান, তিনি নিজেই সবার আগে মেনলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। মেনলে ছিলেন তার সহপাঠী ও বন্ধু। তিনি বলেন, মেনলের কথা প্রচারিত হলে চমকে ওঠে বান্দরবানের ম্রো সমাজ। মেনলের অনুসারীদের বলা হয় ক্রামা। তার প্রবর্তিত বর্ণমালার নাম ক্রামা বর্ণমালা। মেনলে হারিয়ে যাওয়ার পর র্যাং রাং ম্রো মেনলে প্রচারিত ক্রামা ধর্মানুসারীদের ইরিওতের দায়িত্ব পালন করছেন। 'ইরিওত' মানে অনেকটা গোত্রপ্রধান বোঝানো হয়ে থাকে।

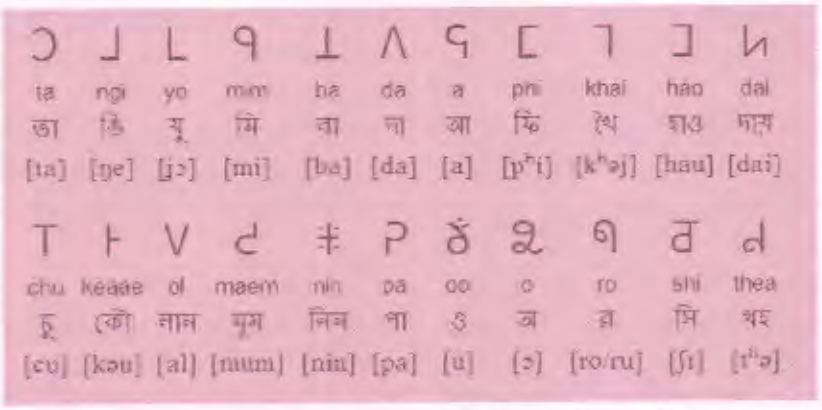

শিশুকাল থেকেই মেনলে আর দশজনের চেয়ে আলাদা ছিলেন। সদা চিন্তাশীল ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন। লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে ১৯৮০ সালে বান্দরবান সদরের সুয়ালকে ম্রো আবাসিক বিদ্যালয় চালু হলে ছুটে এলেন মেনলে। কিন্তু বেশি বয়সের কারণে ভর্তি করতে নারাজ কর্তৃপক্ষ। স্বাভাবিক নিয়মে ভর্তি হতে না পেরে মেনলে স্কুল ক্যাম্পাসেই শুরু করলেন লাগাতার অনশন। পরে স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক টি এন মং তাকে ভর্তি করে নিতে বাধ্য হলেন। এ ঘটনার কয়েক বছরের মাথায় ম্রো জনগোষ্ঠীর সেই ছেলেটিই সবাইকে চমকে দিয়ে উদ্ভাবন করেন নিজ ভাষার বর্ণমালা। মেনলের অন্তর্ধানও রহস্যময় বলে জানালেন প্রায় এক দশক ধরে মেনলে ও তার প্রচারিত ধর্ম ক্রামা নিয়ে কাজ করা তরুণ গবেষক মীর মোকাররম হোসেন। ক্রামা ধর্মানুসারীদের বিশ্বাস আরাকান ও ভারত হয়ে মেনলে হিমালয়ে গেছেন ধ্যান করতে। একদিন তাদের এই ত্রাতা ফিরে আসবেন। মোকাররম জানান, বিভিন্ন সময়ে তিনি মেনলের শিক্ষক, সহপাঠী, আত্মীয়স্বজন ও অনুসারীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং তার এ অনুসন্ধানের সবকিছুই ভিডিও করে রাখছেন। তিনি ভবিষ্যতে মেনলের বর্ণমালা আবিষ্কার থেকে ধর্ম প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি ছবি বানাতে চান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণারত চট্টগ্রাম মহসীন কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. আজাদ বুলবুল বলেন, মেনলের তৈরি করা ম্রো বর্ণমালার সঙ্গে রোমান, শ্যাম, বর্মী ও চৈনিক বর্ণের মিল রয়েছে। তিনি বলেন, ১৯০০ সালের শুরুতে ড. জি এ গ্রিয়ারসন তার 'লিঙ্গুয়েস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গবেষণায় ম্রোদের ভাষার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন, তাদের কোনো বর্ণমালা নেই। গ্রিয়ারসনের সার্ভেতে ম্রো ভাষাকে বর্মী ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে নিশ্চিত হওয়া গেছে ম্রো ভাষা আসলে তিব্বতি-বর্মিজ ভাষা, ভোট-চৈনিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি জানান, মেনলের বর্ণমালায় ৩১টি অক্ষর ও নয়টি সংখ্যা রয়েছে।

ম্রো জনগোষ্ঠী উন্নয়নের পন্থা নামে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি রাংলাই ম্রো বলেন, ক্রামা ধর্মে আস্থা স্থাপন না করলেও ম্রোদের সবাই মেনলে আবিষ্কৃত বর্ণমালা অনুসরণ করছে। নিজে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়ে রাংলাই ম্রো বলেন, বর্তমানে ম্রোদের প্রায় ৬০ শতাংশ ক্রামা ধর্ম পালন করেন। বাকিদের মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং আদি ম্রো ধর্মের অনুসারীরা রয়েছেন। তিনি জানান, ২০১১ সালের আদমশুমারিতে ম্রোদের সংখ্যা ৩০ হাজারের মতো বলা হলেও প্রকৃত সংখ্যা তার দ্বিগুণেরও বেশি।

মেনলে প্রবর্তিত বর্ণমালার সহায়তায় ম্রোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে মেনলেরই গ্রাম পোড়াপাড়ায় 'মো চ চা সাংরা' মানে ম্রো ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩০ জনকে নিয়ে এক বছর মেয়াদি বর্ণমালা শেখানো হয়। পরে এখানে যারা বর্ণমালা শিখেছেন তারাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বর্ণমালা পাঠদানের কাজ করেন। ১৯৯০ সালের ১৮ জানুয়ারি গঠিত হয় ম্রো ভাষা বর্ণমালা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটি। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর মেনরুম ম্রো তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ম্রো ভাষার বর্ণমালাকে পরিচিতি দিতে সফটওয়্যার তৈরি করেন। ২০০৬ সালে আলীকদম উপজেলার মেনরিং চর গ্রামে আবাসিক ব্যবস্থাপনায় ৩২ জন ম্রো নারী শিক্ষিকাকে নিয়ে ভাষা প্রশিক্ষণ এবং মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বান্দরবানের সদর, থানছি, রুমা, রোয়াংছড়ি ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ম্রো শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

রাজীব নূর, সমকাল

পাহাড়ি জনপদের এক শিক্ষার্থীর কাহিনী

বাবা বা নিকটাত্মীয়ের চাকরির সুবাদে প্রাথমিক শিক্ষার সময়ই বেশ কিছু স্কুল বদলাতে হয়েছে অনেককে। কিন্তু আজ আমি যে কিশোরের গল্প শোনাব তার পরিবারের সদস্য বা আত্মীয় স্বজন ঠায় গ্রামে অবস্থান করলেও তাকে বাল্য বয়স থেকে শিক্ষার জন্য পাড়ি দিতে হচ্ছে অনেক পথ। তার নাম অংশুয়েনু মার্মা। সে বিলাইছড়ি উপজেলার অড়াছড়ি পল্লীর সন্তান। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সে অধ্যয়ন করেছে বাড়ি থেকে পাঁচ ঘণ্টা দূরের হাঁটা পথ বড়ইছড়ি নোয়াপাড়া স্কুলে। সেখানে আত্মীয় বাড়িতে থেকে লেখাপড়া। তৃতীয় শ্রেণির লেখাপড়া ছিল বাড়ি থেকে। প্রতিদিন যেতে আসতে আড়াই ঘণ্টা লাগতো। তারপর সে চলে যায় রাজস্থলি উপজেলার বাঙ্গালহালিয়ায়। সেখানে বৌদ্ধবিহারে এক বছরে তিন হাজার টাকা খরচ করে চতুর্থ শ্রেণির লেখাপড়া সম্পন্ন করে। আবার গ্রামে এসে ৫ম শ্রেণির জন্য আগের মতো লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া। পঞ্চম শ্রেণি শেষে রাজস্থলির চিতমরং বিহারে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ চুকায়। এখান থেকেই খবর পায় গোপালগঞ্জ জেলার জলির পাড়ে তিলক মুখার্জি মেমোরিয়াল সেমিনারিতে নিখরচায় পড়ার সুবিধা আছে। কিন্তু সেখানে অষ্টম শ্রেণির লেখাপড়া সারতে গুণতে হয়েছে আট হাজার টাকা। অবশ্য বিশেষ ধর্মাবলম্বী ছেলেদের জন্য স্পন্সরশিপের ব্যবস্থা আছে। সেই নবম শ্রেণি থেকে সে বাঙ্গালহালিয়ায় হোস্টেলে আছে। এখানে থাকার জন্য কোনো টাকা দিতে হয় না। মাসে ১৫০০ টাকায় কোনোভাবে চলে যায় অংশুয়েনুর। এবার এইচ-এসসি পরীক্ষা দিয়েছে বাঙ্গালহালিয়া কলেজ থেকে। এসএসসিতে মানবিক বিভাগে জিপিএ ছিলো ৪.৫। সে তার পরিবারে প্রথম জেনারেশন শিক্ষার্থী। ভাইবোনকে লেখাপড়ায় এগিয়ে নিতে চায়, নিজেও এগুতে চায়। কিন্তু কলা চাষের স্বল্প আয়ে কীভাবে চলবে এই তার চিন্তা। জামুছড়িতে বসে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এ গ্রামে তার দাদু ও কাকা চলে এসেছিলেন শান্তিচুক্তির পর। ২০০৫-৬ সালের সেগুন বাগান নিধন সে প্রত্যক্ষ করেছে। তখন তার বয়স ৯ বছর। তার বাবা শ্রম বিক্রি করে ভালো আয় করেছেন, কিন্তু একটা ব্যাংক হিসাব করার মতো সচেতনতা তাঁর ছিল না। সে জন্য তার অনেক আক্ষেপ। এখনো লেখাপড়া করে চাকরি পাওয়া নিয়ে সে খুব সংশয়ে আছে। টাকা ছাড়া চাকরি হয় না এমনটিই সে প্রত্যক্ষ করছে বলে জানায়। জামুছড়িতে বয়স্ক শিক্ষা, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা তাকে খুব আপ্লুত করে। এখানে বয়স্কদের জন্য যে সব স্বশিখন বই আছে, স্কুলে বসে সে এগুলো পড়ে নিচ্ছে। বইয়ের গল্প তার খুব ভালো লাগে। অংশুয়েনুর প্রচণ্ড ইচ্ছে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। পারিবারিক দৈন্যের কারণে সে খুব চিন্তিত।

অংশুয়েনু মার্মা এসএসসিতে যে রকম ফলাফল করেছিল, এইচএসসিতে তা পারেনি। সে এইচএসসি পাশ করেছে , তবে জিপিএ হচ্ছে ২.২৬। তারপরেও সে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায়।

আ.ন.স হাবীবুর রহমান

আদিবাসী শিক্ষা প্রসারে মাসাউস-এর কার্যক্রম

উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের অধিকার আদায় ও উন্নয়নে যারা কাজ করছে, তাদের মধ্যে মাসাউস অন্যতম। রাজশাহী অঞ্চলে খুবই পরিচিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হচ্ছে মাসাউস। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। মাসাউস ১৯৮০ সালে জনসংগঠন হিসেবে সংগঠিত হয়। এই সময় শুধু মাহালে জাতির লোকদের শিক্ষার (বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, এসএসসি ফরম পূরণে সহযোগিতা, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিনা টাকায় আবাসিক কোচিং) উন্নয়নে কাজ শুরু করে। ২০০০ সালে এনজিও হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে রাজশাহী সিটি করপোরেশন এলাকায় মাহালে আদিবাসীদের নিয়ে কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী জেলার পবা, গোদাগাড়ী ও তানোর উপজেলার আদিবাসী গ্রামে মাহালে, সাঁওতাল, উরাঁও, কর্মকার, পাহাড়িয়াসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের নিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে চলেছে।

মাসাউস'র লক্ষ্য হলো মাহালেসহ সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। মাসাউস যে সব বিষয় নিয়ে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে, তা হলো: ১) মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম (এমএলই) ও শিক্ষা কার্যক্রম, ২) আদিবাসীদের অধিকার, ৩) আদিবাসী সংস্কৃতি (নাচ-গান, ঐতিহ্য, সামাজিক উৎসব, সামাজিক কাঠামো ও আইন) সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, ৪) মাহালে ভাষা গবেষণা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ৫) যুব সমাজের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৬) বাঁশজাত পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন,

৭) ক্লাইমেট চেইন্জ এবং কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন, ৮) দলিত ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ৯) জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার।

মাসাউস মাহালে সংস্কৃতি রক্ষা, সংরক্ষণ ও চর্চার জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় ৫ গ্রামের ৮৫ জন যুবক-যুবতিকে মাহালে নাচ ও গান-এর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তাছাড়া ২৮টি গান নিয়ে মাহালে ঝুমের গানের এলবাম 'লারকোইনা ঝুমের সাজোনী' প্রকাশ করে। মাসাউস'র উদ্যোগে প্রায় ৫০ বছর পর ২০০৬ সালে মাহালে জাতির সামাজিক উৎসব 'জিতিয়া পার্বণ' পালন শুরু হয়। উত্তরবঙ্গে প্রথম এমএলই কার্যক্রম শুরু হয় মাহালে ভাষাকে কেন্দ্র করে। ২০০৬ সালে মাসাউস'র উদ্যোগে এবং এসআইএল-বাংলাদেশ-এর কারিগরি সহযোগিতায় মাহালে নেতৃবর্গ রোমান বর্ণমালাকে লেখা ও পড়ার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মাহালে বর্ণমালায় রূপান্তর করার পদক্ষেপ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সুরশুনিপাড়া ও সিঞ্জাঘুটু গ্রামে এবং তানোর উপজেলার চকরতিরাম (পিপরা) গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে এমএলই স্কুল শুরু করে। বর্তমানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় ৩টি এবং এমসিসি-বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ৩টি মোট ৬টি এমএলই স্কুল পরিচালিত হচ্ছে।

মাসাউস আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার জন্য সহযোগিতা প্রদান করে। একই সঙ্গে আদিবাসীদের সচেতন করার জন্য এডভোকেসি প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে অনেক দরিদ্র আদিবাসী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলে এসেছে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা আরো দৃঢ় হচ্ছে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে এগিয়ে যাচ্ছে। মাসাউস আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এবং সংযোগ স্থাপনে কাজ করে। সিবিওদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে রাজশাহীর প্রসিদ্ধ রেশম শিল্পকে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংযোগ তৈরি করে দেয়। ফলে বিভিন্ন এলাকায় রেশম বা তুঁত গাছ রোপণ করা হয়। এছাড়ও ২৫ দিনব্যাপী তুঁত চাষ ও গুটি উৎপাদনের জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রেশম বোর্ড ১১ জনকে তুঁত চাষ ও গুটি উৎপাদনের উপর এক মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বর্তমানে রেশম গুটি উৎপাদন করছেন এবং বাড়তি আয় করছেন।

মাইকেল মানড্রি

সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের উদ্যোগে

ফিলিপাইনে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন

গত ২৬ জুলাই থেকে ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ ফিলিপাইনে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমের উপর একটি শিখন পরিদর্শন কর্মসূচি আয়োজন করে। এ পরিদর্শন দলে সরকারি, বেসরকারি, সহযোগী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ জন প্রতিনিধি ছিলেন। এরা হলেন মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, তানভীর আহমেদ, উপ-সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মোশতাক আহমেদ ভুঞা, কন্ট্রোলার, বই বিতরণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মোঃ সাইদুজ্জামান, বিশেষজ্ঞ, সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিনোদন ত্রিপুরা, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ'র ম. হাবিবুর রহমান, সিনিয়র শিক্ষা উপদেষ্টা, মেহেরুন্নাহার, প্রকল্প পরিচালক-শিশুর ক্ষমতায়ন এমএলই, দেবপ্রিয় চাকমা, ব্যবস্থাপক-এমএলই ও মোঃ মোসলে উদ্দিন ভুঁইয়া, ব্যবস্থাপক-প্রাথমিক শিক্ষা।

পরিদর্শন দল Komisyon ng Wikang Filipino-এর সঙ্গে সভা করে। এসময় সেভ দ্য চিলড্রেন ফিলিপাইনের কমিশনার Virgilio Almario এবং তার টিম কমিশনের উদ্দেশ্য ও কাজ বিষয়ে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রপতি অফিসের অধীনে পরিচালিত কমিশন শিক্ষা উপকরণ অনুমোদন করে; এর ৫টি বিভাগ রয়েছে (শিক্ষা, সাহিত্য,অনুবাদ, ব্যাকরণ, নেটওয়ার্কিং)। কমিশন ১৩৯টি ভাষাকে অনুমোদন দিয়েছে। ১৯টি ভাষায় রোমান বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়; মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার জন্য ১০টি থিমেটিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। সভায় বহুভাষার বৈচিত্র্য ও ভাষা নির্ণয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হয়।

লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি অব ফিলিপিন্স (Linguistics Society of the Phillipines)-এর সঙ্গে পরিদর্শক দল সভা করে। লিঙ্গুইস্টিক বিভাগ গত বছর বিভিন্ন ভাষার সমস্যা এবং তার সমাধানকল্পে কিছু গবেষণার ক্ষেত্র বিষয়ক কর্মশালার (different language challenges and gaps for creating an avenue for identifying further research areas) আয়োজন করে। এই বিভাগ মূলত ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে কোর্স পরিচালনা করে। পরিদর্শন দল সাউথ সেন্ট্রাল মিন্দানাও সেভ দ্য চিলড্রেন প্রোগ্রাম অফিসের কর্মসূচি ও নিরাপত্তা বিষয়ে অবগত হয়।

এরপর পরিদর্শন দল সাউথ কোটাবাতুর প্রভিন্সিয়াল গভর্ণর-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। গর্ভণরের মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ে সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর সন্তানও মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক বিদ্যালয়ে পড়ে। ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন রিজিওনাল অফিসে রিজিওনাল ডিরেক্টর Allan G Farnazo এর সঙ্গে প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করে এখানে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন রিজিওনাল অফিসের উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে জানানো হয়।

বাগুমবাভান, সুলতান কুদরত প্রদেশের ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করে। তিনি মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বাস্তবায়নে তার অফিসের কার্যাবলী বর্ণনা করেন। মেয়র অফিসে সৌজন্য সাক্ষাতের পর পরিদর্শন দল দাতু সাংকি অকই ইলিমেন্টারি স্কুলে শ্রেণিকক্ষের ভেতরের ও বাইরের পরিবেশ, মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, শিক্ষকের দক্ষতা, শিখন-শেখানো পদ্ধতি পরিদর্শন করে। প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, স্কুল সুপারভাইজার ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তারপর শিক্ষকদের সঙ্গে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বাস্তবায়নে তাদের আগ্রহ, অর্জন, চ্যালেঞ্জ বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তর সেশনে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদল তাবলো ইলিমেন্টারি স্কুল নামে আরেকটি সরকারি ইলিমেন্টারি স্কুল পরিদর্শন করে।

মেহেরুন্নাহার সপ্না

ভদ্র ম্রং: এক আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা

'১৯৭১ সাল। আমি তখন হালুয়াঘাট মডেল স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্র। বন্ধুরা সবাই মিলে গোলাগুলি খেলা খেলতাম। দুই দলে ভাগ হওয়াটা ছিল খেলার নিয়ম। হিন্দুস্থান দেওয়া হতো এক দলের নাম। অন্য দলটি পাকিস্তান। সবাই বানিয়ে নিতাম বাঁশের তৈরি ছোট ছোট বন্দুক। দুই দলের মধ্যে শুরু হতো গোলাগুলি। মিছিমিছি গুলি ছুঁড়তাম একে অপরকে। তাতেই ছিল অন্যরকম মজা। প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা আমরা মগ্ন থাকতাম এই গোলাগুলি খেলায়। কিন্তু তখনো ভাবিনি, এক সময় সত্যি সত্যি এ দেশেই গোলাগুলি শুরু হবে। হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র।' এভাবেই কথা শুরু করেন আদিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ভদ্র ম্রং। যিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ ও ১ নম্বর কোম্পানি কমান্ডার ফজলুল রহমানের নেতৃত্বে। ভদ্র ম্রং ছিলেন ১ নম্বর প্লাটুনের সেকশন কমান্ডার। কোনো কোনো সময় প্লাটুন বা কোম্পানি কমান্ডার না থাকলে তাকেই কোম্পানি বা প্লাটুনের দায়িত্ব পালন করতে হতো।

মুক্তিযোদ্ধা ভদ্র ম্রং বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার রাংরাপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। কিন্তু তার শৈশব কেটেছে পার্শ্ববর্তী ধোবাউড়ার সাংখোলা নামক গ্রামে। বাবা রজিন্দ্র ঘাগ্রা ও মা বিশ্বমনি ম্রংয়ের ছেলে ভদ্র ম্রংয়ের পড়াশোনার শুরু রতনপুর প্রাইমারি স্কুলে। ১৯৬৪ সালে তিনি ধোবাউড়া থেকে চলে যান দুর্গাপুরে। বিরিশিরি মিশনারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে দুর্গাপুরে বিভিন্ন মিছিল-মিটিংয়ে তিনি যুক্ত ছিলেন বন্ধু জালাল উদ্দিন তালুকদারের সঙ্গে। ১৯৭১-এর শুরুতে ভদ্র ম্রং চলে আসেন হালুয়াঘাটে। ভর্তি হন মডেল স্কুলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিলের শুরুতেই পরিবারের সঙ্গে চারুয়াপাড়া সীমান্ত পেরিয়ে ভদ্র ম্রং চলে যান ভারতের বাগমারা শরণার্থী ক্যাম্পে। শরণার্থী ক্যাম্পের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তখন সেখানে খাবারের খুব কষ্ট ছিল। আমরা দূর থেকে বাঁশ কেটে এনে বিক্রি করতাম। মানুষের জীবন ছিল খুব খারাপ।' কিন্তু এভাবে আর কত দিন? নিজের দেশকে মুক্ত করতে হবে। তাই কয়েক বন্ধুসহ ভদ্র ম্রং সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে যাওয়ার। পরিবারকে না জানিয়ে একদিন বন্ধু তাপস, অরবিন্দু, পীযুষ ঘাগ্রাসহ ভদ্র ম্রং ট্রেনিংয়ের জন্য নাম লেখান বাগমারা ইয়ুথ ক্যাম্পে। দশ দিন ট্রেনিং চলে। অতঃপর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় তুরার রংনাবাগ ট্রেনিং ক্যাম্পে। একুশ দিনের গেরিলা ট্রেনিং নেন ভদ্র ম্রং। তাঁর ভাষায়, '২১ বছরের ট্রেনিং নিয়েছি ২১ দিনে।' ৭ নম্বর কোম্পানিতে ভদ্র ম্রংরা ৯১ জন ছিলেন। এর মধ্যে আদিবাসী গারো ছিলেন ১০ জন আর হাজং ১ জন।

ট্রেনিং শেষে মুক্তিযোদ্ধা ভদ্র ম্রংদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় দুর্গাপুরের দক্ষিণে বাদামবাড়ির সামনে রাঙাছড়ায়। সেখানকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াও তিনি অপারেশন করেছেন দুর্গাপুরের সিও ডেভেলপমেন্ট অফিস, গোপালপুরসহ বিভিন্ন এলাকায়। বিজয়ের দিনে তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ শহরে। ভদ্র ম্রং বলেন, 'কী যে ভালো লেগেছিল সেদিন। আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ে উল্লাস করেছি আমরা।'দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযোদ্ধা ভদ্র ম্রং নিজেকে যুক্ত করেন শিক্ষকতা পেশায়। ঝিলাগড়া মিশনারি স্কুলে ষাট টাকা বেতনে চাকরি শুরু করেন। ২০০০ সালে রাংরাপাড়া সরকারি প্রাইমারি স্কুল থেকে অবসর নেন।

মুক্তিযোদ্ধা ভদ্র ম্রং বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসী-বাঙালিতে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। বাঙালি সহযোদ্ধা বন্ধু কাঞ্চন ও লাল মিয়ার কথা বলতে বলতে ভদ্র ম্রংয়ের চোখ ভিজে যায়। বাল্যবন্ধু তাপস ডিও, অরবিন্দু ডিও, পীযুষ ঘাগ্রার স্মৃতি আজও অম্লান। ফুটবল, দাঁড়িয়াবান্ধা আর গুলতি খেলা শুধু নয়, এ বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন ভদ্র ম্রংয়ের পাশে। একাত্তরে আদিবাসীদের ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে ভদ্র ম্রং বলেন, 'আমরা প্রায় দুই হাজার গারো আদিবাসী মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। হালুয়াঘাটে শহীদ হয় আড়ং রিসিল ও পরিমল দ্রংসহ তিনজন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের শরীর গরম পানিতে ঝলসে দিয়ে গাড়ির পেছনে বেঁধে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। দেশের জন্য আদিবাসীরা যুদ্ধ করেছে, শহীদ হয়েছে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আদিবাসীরা কী পেয়েছে?'

সালেক খোকন
সূত্র : ইন্টারনেট

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত **গণসাক্ষরতা অভিযান** - এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় **গণসাক্ষরতা অভিযান** কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org

European Union